ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত গনপরিষদ দ্বারা ভারতের সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি এই সংবিধান কার্যকরী হয়। এই সংবিধানের সপ্তম তফসিলের নির্দেশক নীতির মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে বহু ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলির মধ্যেআমাদের আলোচ্য বিষয় হল–

(১) নারী শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা,

(২) শিক্ষায় সমসুযোগ সংক্রান্ত ধারা,

(৩) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা,

(৪) তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা।

(১) নারী শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাঃ–

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে সংবিধানের ১৫(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার কোন নাগরিককে লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে আলাদা করতে পারবে না। শিক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সমান অধিকার থাকবে।

(২) শিক্ষায় সমসুযোগ সংক্রান্ত ধারাঃ-

শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে সংবিধানে যে ধারাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল–

i) ২৯ নম্বর ধারা– এখানে বলা হয়েছে যে, সরকার পরিচালিত বা সরকারি অনুদানে পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, জাতি, ভাষা ও বর্ণের অজুহাতে কোন ছাত্রকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ii) ৪১ নম্বর ধারা– এখানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। রাষ্ট্রকে নাগরিকের সেই অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

iii) ৪৫ নম্বর ধারা– এখানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান চালু হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলে মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে সচেষ্ট হতে হবে।

৩) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারাঃ-

সংবিধানে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রসঙ্গে যে ধারাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি হল–

i) ৩০(১) নম্বর ধারা– এখানে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজেদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে।

ii) ৩০(২) নম্বর ধারা– এই ধারা অনুযায়ী ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে সংখ্যালঘু অজুহাতে সাহায্য দানে রাজ্য কোন বৈষম্য করতে পারবে না।

iii) ৩৫০(১) ধারা– এই ধারায় বলা হয়েছে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় তাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

৪) তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষাঃ–

সংবিধানে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ৪৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমাজের দুর্বল শ্রেণি বিশেষত তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক শোষণ ও অবিচার থেকে রক্ষা করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির (1986) মূল বিচার্য বিষয়

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি নতুন একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়, যা জাতীয় শিক্ষানীতি - ১৯৮৬ নামে পরিচিত। এই শিক্ষানীতির মূল আলোচ্য বা বিচার্য বিষয়গুলি ছিল —

১) ভূমিকা–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম আলোচ্য অংশ ছিল ভূমিকা। এখানে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়নি। তাই ১৯৮৬ সালে পুনরায় একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হল।

২) শিক্ষার লক্ষ্য ও দায়িত্ব–

শিক্ষার লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি - ১৯৮৬ তে বলা হয়েছে-- শিক্ষা হবে সকলের জন্য, শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাদের বিদ্যালয় মনস্ক হতে সাহায্য করা।

৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা–

ভারতের সংবিধানের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হবে দেশের সকল শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত সমমানের শিক্ষা লাভ করবে। এর জন্য একটি জাতীয় আবশ্যিক পাঠ্যক্রম থাকবে এবং সমগ্র দেশের শিক্ষাক্রম হবে ১০+২+৩ বৎসরের।

৪) সাম্যের জন্য শিক্ষা–

জাতীয় শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্যের জন্য শিক্ষা। সাম্যের জন্য শিক্ষায় বলা হয়েছে দেশের অনুন্নত সম্প্রদায় যথা-তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি; এছাড়া সংখ্যালঘু, মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এদের সকলকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা দূর করতে হবে।

৫) বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন–

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পুনর্গঠন বলতে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—

i) শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সঠিক উপায়ে রূপায়িত করতে হবে।

ii) দেশের সকল ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি করতে হবে এবং তাদের ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষারত রাখতে হবে। সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য “Operation Blackboard” নামক কর্ম প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

iii) মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। মেধাবি ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে দেশের প্রতিটি জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

iv) উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য বর্তমান কলেজ গুলিকে উন্নত মানের কলেজে রূপান্তরিত করতে হবে। পাশাপাশি স্বয়ং শাসিত কলেজ বা Excelent Collage এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

v) সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে মুক্তশিক্ষা ও দূরাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) কারিগরি ও পরিচালনার শিক্ষা–

বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কারিগরি ও পরিচালনা শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। এর জন্য করনীয় হল –

i) তথ্য প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করা,

ii) বিদ্যালয় স্তর থেকে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা,

iii) কারিগরি বিষয়ে উন্নত গবেষণার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৭) শিক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয়করণ–

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এর জন্য সকল শিক্ষকের উচিত সঠিক পাঠদান করা এবং সকল শিক্ষার্থীর কর্তব্য পাঠ গ্রহণ করা।

৮) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস—

i) দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ii) মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।

iii) পাঠ্যপুস্তকের গুনগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।

iv) প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন করতে হবে।

v) শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে কর্ম অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

vi) বহিঃ পরীক্ষার প্রাধান্য হ্রাস করে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং গ্রেড প্রথা চালু করতে হবে।

৯) শিক্ষক–

মর্যাদার দিক থেকে শিক্ষককে সমাজের উপরে স্থান দিতে হবে। শিক্ষকের বেতন ও চাকরির শর্তাবলি তাদের সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান DIET (District Institute Of Education and Training) স্থাপন করা হবে। প্রতিটি রাজ্যে শিক্ষক শিক্ষণকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে NCTE (National Council Of Teacher Education) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা–

শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরিচালনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত সংস্থা গুলি থাকবে।

i) জাতীয় স্তরে শিক্ষার উন্নতির জন্য থাকবে CABE (Central Advisory Board of Education)।

ii) রাজ্য স্তরে শিক্ষার উন্নতির জন্য থাকবে SABE (State Advisory Board of Education)।

iii) জেলা স্তরে থাকবে DBE (District Board of Education)।

iv) শিক্ষার উপযুক্ত পরিচালন কাঠামো গড়ে তোলার জন্য থাকবে IES (Indian Education Service)।

১১) সম্পদ ও পর্যালোচনা–

জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব রুপায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে ধীরে ধীরে শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বরাদ্দ যাতে ৬% ছাড়িয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রতি ৫ বছর অন্তর শিক্ষানীতি কতটা কার্যকরী হল তা খতিয়ে দেখতে হবে।

১২) ভবিষ্যৎ–

ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার গঠন খুবই জটিল। তবুও ভবিষ্যৎ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মজবুত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতির তুলনামূলক আলোচনা

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি কর্তৃক যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল তা ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত হয়েছিল। নিচে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হল

১) শিক্ষার রূপ–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথাগত শিক্ষার উপর সবথেকে বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

২) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সমগ্র ভারতে একই ধরণের শিক্ষা কাঠামো, পাঠ্যক্রম, নিয়মকানুন মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে সারাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, নিয়মকানুন চালু করতে সুপারিশ করেছেন।

৩) শিক্ষায় সমতা–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বেশী বেশী সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪) বয়স্ক শিক্ষার প্রসার–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে করেসপণ্ডেন্স কোর্স ও মুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

৫) প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২ টি ঘর, ২ জন শিক্ষকের (১ জন মহিলা) কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর আরও বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩ টি ঘর, ৩ জন শিক্ষক, বিনামূল্যে বইখাতা, পোশাক, দুপুরের খাবার ইত্যাদি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৬) মাধ্যমিক শিক্ষা–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পাঠ্যক্রমকে বৃত্তিমূলক করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বল্প মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৭) চাকরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করা—

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে চাকরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে। অপর দিকে ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে চাকরি থেকে ডিগ্রিকে আলাদা করার জন্য পাঠ্যক্রম সংশোধন করতে হবে।

৮) পরীক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির একটি বড় ঘাটতি অমনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি। ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরীক্ষা পদ্ধতিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে মনোবিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

৯) শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি–

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। অপরদিকে, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং, ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির অসম্পূর্ণতাকে দূর করে তাকে আরও বাস্তবমুখী ও কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করেছিল।